Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : III, 15th, June, 2020 আষাঢ়, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

লকডাউনের মধ্যে জুন ২০২০ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। অতিমারির খবর প্রকাশে আমরা খুব একটা আগ্রহী নই। প্রতি নিয়ত মিডিয়া (পত্রিকা এবং টিভি) করোনা-সংবাদে কণ্টকিত। আমরা বরং সংগ্রামের, শুভ প্রয়াসের খবরে উৎসাহী। কারণ, ''যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,/সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,/ তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,/এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা॥'' এবারের সংখ্যায় একটা স্কুল গড়ে তোলার, সাধারণ মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সংগ্রামের কথা প্রকাশ করেছি। আপনাদের কাছ থেকে আরও খবরের প্রত্যাশায় রইলাম।

আমরা ধিক্কার জানাই উভয় সরকারকে, যাদের অবহেলায় জনস্বাস্থ্য ধূলায় লুণ্ঠিত এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা মুনাফালোভীদের মৃগয়া-ক্ষেত্রে পরিণত। আমরা ধিক্কার জানাই সেইসব মানুষদের যারা রোগকে নয়, রোগীকে ঘৃণা করছে। তাই অসহায় করোনারোগীকে অচ্ছুত হয়ে থাকতে হচ্ছে।

ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, ঘরে থাকুন। নিয়মবিধি মেনে চলুন।

আমাদের বিদ্যাসাগর (৩য় পর্ব)

গৌতম রায়চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা সাঙ্গ করে বিদ্যাসাগর ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কলেজের প্রশংসা পত্র লাভ করেন। এর অন্তত দু'বছর আগেই তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন। পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে সেরেস্তেদার বা প্রধান পণ্ডিত এবং পাঁচ বছর পর ১৮৪৬ সালের ৬ এপ্রিল, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা। এই সময়ের দুটি ঘটনা উল্লেখ্য, যা বাঙালি মানসে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

প্রথম ঘটনা উপলক্ষেই শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত উক্তি ঃ ''ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পা-খানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি।'' ঘটনার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে করেছেন—''একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপর উর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া, বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতা রক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর ঐ কার সাহেব কার্যবশত সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসাতির করিয়া এই অহংকৃত

ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন"। (বিদ্যাসাগরচরিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। পরের বিদ্রুপটির জন্য চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা শুনুন ঃ "শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ৎ তলব করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরা অসভ্য, সুসভ্য ইংরাজী মতে লোকের অভ্যর্থনা করিতে হইলে, বুঝি এরূপই করিতে হয়। আমি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের নিকট ঐরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং অবসর পাইয়া সাহেবের প্রতি সে সম্মান দেখাইতে কৃপণতা করি নাই।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৩৪)

পরবর্তীকালে কলেজ পরিচালনা নিয়ে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটে। তিনি ইস্তফা দিলেন। সেটা গৃহীত হল না। কলেজের তেরোজন অধ্যাপক ইস্তফা প্রত্যাহারের জন্য লিখিত আবেদন করলেন। তিনি অনমনীয়। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ইস্তফাপত্র গৃহীত হল ১৮৪৭ সালের ১৬ জুলাই। সে আমলে এককথায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। রসময় দত্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—"চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কী?" নির্ভীক বীরপুরুষ তীক্ষ্ম কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, "কেন আলু-পটল বেচব, মুদির দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না।" (চণ্ডীচরণ পৃ. ৬৬)

অবশ্য বিহদ্যাসাগরকে 'আলু-পটল' বিক্রি করতে হয় নি। বাংলা পাঠ পুস্তক রচনা এবং পরে ছাপাখানা (সংস্কৃত যন্ত্র) প্রতিষ্ঠার ফলে তার অর্থের অভাব হয় নি। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দেন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সহকারী সম্পাদক হিসাবে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের যে সূচনা করেছিলেন, অধ্যক্ষের সর্বময় ক্ষমতা লাভ করার পর দ্বিগুণ উৎসাহে তাতে প্রবৃত্ত হলেন। এই কাজেও তার রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকদের উপস্থিতির কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। এদিকে অধ্যাপকরা অধিকাংশই তার শিক্ষক, তাই তিনি সর্বদাই একটু কুণ্ঠিত থাকিতেন। কলেজের শিক্ষকদের শৃঙ্খলা কিছুতেই স্থাপন করতে না পেরে বিদ্যাসাগর এক অভিনব পন্থার আশ্রয় নিলেন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজেরই উপর তলায় থাকিতেন। যখনই দেখতেন কেউ সাড়ে দশটার পরে আসছেন, তখনই গেটের সামনে গিয়ে বলতেন,—'এই এলেন নাকি?' সপ্তাহ খানেকের মধ্যে উপস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু বিদ্যাসাগর, অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে 'এই এলেন নাকি?' এই কথাগুলিও বলতে পারতেন না। কারণ তিনি গুরুর প্রিয় ছাত্র। এদিকে অধ্যাপক জয়নারায়ণই সবচেয়ে দেরীতে আসতেন। বিদ্যাসাগর গুরুর আগমন প্রতীক্ষায় কলেজের গেটে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। "ক্রমাগত এইরূপ করায়, বৃদ্ধ শিক্ষক একদিন মার্তণ্ড মূর্তি ধারন করিয়া ছাত্র-অধ্যক্ষকে বলিলেন, "তুমি যে কিছু বল না, এতেই সর্বনাশ করিলে। কথা কহিলে একটা জবাব দিতে পারিতাম, কি জন্য দেরী হয় তাও বলিতে পারিতাম, এমন করে জব্দ করিলে আর উপায় কি? মরি আর বাঁচি, কাল হইতে ঠিক সময়ে আসিব।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৭১)

ছাত্ররাও তখন যখন খুশি কলেজে আসত, যখন খুশি চলে যেত। বিদ্যাসাগর সেসব অনিয়ম পুরোপুরি বন্ধ করলেন। তিনি কলেজে খুব গম্ভীর থাকতেন, কিন্তু কলেজের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে সমবয়সীর মতো মিশতেন। পড়ানোর সময় শারীরিক নির্যাতন একদম পছন্দ করতেন না। ক্লাস

চলাকালীন নিয়মিত টহল দিতেন এবং লক্ষ্য রাখতেন। এই প্রসঙ্গে দুটো মজার ঘটনার কথা বিহারীলাল সরকার বলে গেছেন।

বিদ্যাসাগর একদিন দেখলেন, একজন অধ্যাপক ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে! তুমি যাত্রার দল খুলেছ নাকি? তাই ছোকরাদের তালিম দিচ্ছ। তুমি বুঝি দূতী সাজবে?

আরেকদিন এক অধ্যাপকের টেবিলে একগাছা বেত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—বেত কেন হে? উত্তরে অধ্যাপক বলিলেন—মানচিত্র দেখানোর সুবিধা হয়। বিদ্যাসাগর বলিলেন—রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হয়। ম্যাপ দেখানোও হয়, ছেলেদের পিঠেও পড়ে। (করুণসাগরের বিদ্যাসাগরে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪১)

ভারত সরকারের তরফে তাঁর কাজে নানাবিধ হস্তক্ষেপের জন্য ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ও অন্যান্য সরকারি পদ থেকে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৫০ সালটি বিদ্যাসাগরের জীবনে নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই বিদ্যাসাগরের হাতে সমাজবিষয়ক রচনার সূচনা হয়। ক্রমে তিনি সমাজ সংস্কারে মেতে ওঠেন। তিনি নিজেও মনে করতেন, তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাস হল। যত সহজে বললাম, ব্যাপারটা তত সহজ ছিল না। বিধবা বিবাহের বিরোধীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। হিসেব করে দেখা গেছে, স্বপক্ষের চেয়ে বিপক্ষের আবেদনের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তা সত্ত্বেও আইন পাস হবার পর তীব্র সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত দেশে হৈচৈ পড়ে গেল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ প্রমুখরা মনে করতেন বিধবাবিবাহ প্রচলন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। শান্তিপুরের তাঁতিরা বিদ্যাসাগর-পেড়ে শাড়ি বের করল, যাতে লেখা থাকত "সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে"... ইত্যাদি। বিপক্ষ দল আবার ব্যঙ্গ করে গান বার করল—"শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।" শুধু গান নয়, অনেকেই প্রকাশ্যে বিদ্যাসাগরকে গালাগালি করত, ঠাট্টা করত, এমনকি মেরে ফেলবার ভয়ও দেখিয়েছে। বীরসিংহ গ্রামেও খবরটা পৌঁছে গেল। ঠাকুরদাস, বিদ্যাসাগরের দেহরক্ষী হিসাবে জেলে-সর্দার, লাঠিয়াল শ্রীমন্তকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে কিন্তু ভয় পান নি। এই টালমাটাল অবস্থায়ও বিদ্যাসাগরের সাহস ও রসিকতার দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে বিহারীলাল সরকার ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

"বিদ্যাসাগর একদিন শুনলেন কলকাতার একজন বড়মানুষে তাঁকে মারবার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়েছে। তারা সুযোগ পেলেই বিদ্যাসাগরকে মারবে। বিদ্যাসাগর সটান সেই বড়মানুষের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বললেন—'শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনাদের ভাড়াটে লোকেরা আহার-নিদ্রা ছেড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আমি ভাবলাম, এদের কষ্ট দেবার দরকার কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।"

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত ঘটনাটি তাঁর রঙ্গ প্রিয়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"একবার এক বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ সভাস্থলে তাঁহার একজন বন্ধু নিজের একটি সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে আনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বেঁচে থাক মা, বিয়ে হোক, বিধবা হও, আমি আবার বিয়ে দি।" সভাস্থ সকলে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আরে, আমার বন্ধুদের

মেয়েরা বিধবা না হলে আমি বিবাহ দেব কার?" (শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাত:স্মরণীয় বিদ্যা, পৃ. ২২)

"বিদ্যাসাগর" উপাধি পেয়েই তাঁর পড়াশোনার শেষ হয় নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যাচর্চায় রত ছিলেন। নিজের ব্যবহারের জন্য বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি ও সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশাল পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বই কিনতেন, পড়তেন তারপর সুন্দর করে বাঁধিয়ে রাখতেন। বই বাঁধানো নিয়ে দুটি মজার ঘটনা আছে। প্রথমটি চণ্ডীচরণ বলেছেন—"একবার একজন সম্ভ্রান্তলোক পুস্তকগুলি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এরূপ অর্থব্যয়ে এই পুস্তকগুলি বাঁধান কি ভাল?' তদুত্তরে বিদ্যাসাগর—"কেন দোষ কি?" প্রত্যুত্তরে বাবু বলিয়াছিলেন "ঐ টাকায় অনেকের উপকার হইতে পারিত।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন আর কিছু না বলিয় অন্য কথা পাড়িলেন, শেষে তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ জোড়টী কোথায় কত টাকায় খরিদ করিয়াছেন? জিনিসটী ত বেশি হইয়াছে।" বাবু একটু অসাবধান হইয়া শালের নানাবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এ জোড়াটি পাঁচশত টাকায় খরিদ ছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় অমনি বলিলেন, "পাঁচ সিকার কম্বলেও ত শীত ভাঙ্গে, তবে এত টাকার শাল জোড়টা গায়ে দিবার প্রয়োজন কি? এ টাকায়ও ত অনেকের উপকার হইতে পারিত; আমি ত মেটো চাদর গায়ে দিয়া থাকি।" বাবুর সুবর্ণ মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল।" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ১২৭)

দ্বিতীয় ঘটনাটি দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী বলেছেন। এক বিদ্যাসাগর ভক্ত ঃ 'এত খরচ করে এ সকল বই বঁধিয়ে আনার দরকার কি?

বিদ্যাসাগর ঃ ভালবাসি বলে। তুমি তোমার কুরূপা স্ত্রীকে অত রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে টাকা নষ্ট করো কেন? (করুণসাগরে উদ্ধৃত) [ক্রমশ]

বিদ্যালয় গঠনের ইতিহাস

ছায়া মুখার্জী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যেহেতু বিদ্যালয় কক্ষের কোন দরজা-জানলা নেই, তাই প্রতিদিনই গিয়ে দেখতাম বেঞ্চিগুলি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে রাখা। স্থানীয় লোকজন এখানে ঘুমিয়ে থাকতো। প্রতিদিন বিদ্যালয় গিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হত। যেস্থানে বিদ্যালয়টি ছিল তা কিছুটা রেলের এবং কিছুটা খাস জায়গা ছিল। রেল কলোনীর প্রেসিডেন্ট প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর থেকে পাঁচকাঠা জায়গা বিদ্যালয়ের নাম দলিল করিয়ে নিলাম। স্থানীয় কাউন্সিলর ডঃ হৈমী বসুর কাছে জল ও টয়লেটের জন্য আবেদন করতে লাগলাম। জানি না কেন অজানা কারণে উনিও কিছুই দিলেন না। তবুও আমি হাল ছাড়িনি। ক্রমাগত ওনার কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছি। তার সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা রোটারী ক্লাব এবং সি. এম. ডি. এ.-কেও আবেদন জানাচ্ছি বিদ্যালয় পাকা কক্ষ ও টয়লেট বানানোর জন্য।

এরপর অবশ্য কাউন্সিলর ডঃ হৈমী বসু একটি ভালো পানীয় জলের কল তৈরী করে দিলেন বিদ্যালয়ের পূর্বপ্রান্তে। কিন্তু তাতেও শান্তি ছিল না। আমি পাড়ার লোকের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এবং কলটাকে ভালো রাখার জন্য চেন তালা দিয়ে আটকে রাখলাম। কিন্তু পরের দিন স্কুলে গিয়ে দেখি পাশের বাড়ির লোকেরা তালা ভেঙ্গে রেখেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারলাম যে তাদের ওই কল থেকে জল নিতে দিতে হবে নইলে কল ভেঙ্গে দেবে। অথচ তাদের জন্য আলাদা টিউবয়েল ছিল।

এমতাবস্থায় তাদের সঙ্গে আপসে আসতে

হলো যে তারা জল নিয়ে আবার তালা দিয়ে রাখবে। এরপর পাড়ার অন্যান্য লোকেদের সাথে তাদের বচসা বাধে যে অন্যদের ওই কল থেকে জল দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত অত্যাচারে কলটা ভেঙ্গে যায়। আমরা নিজেরাও বোতলে স্থানীয় জল বহন করি ও ছাত্রছাত্রীদেরও বোতলে জল বহন করে আনতে বলি।

পরবর্তী কাউন্সিলর স্বদেশরঞ্জন দাশের (শিক্ষক) কাছেও ক্রমাগত জলের জন্য দরবার করতে থাকি। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চাইলেও কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মীরা আমাদের বিদ্যালয়ে জল কিছুতেই দিলেন না।

ইত্যবসরে সি. এম. ডি.এ-র তরফে একটি পাকা শৌচালয় বিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্ব কোণে স্থাপিত হল। খোলা জায়গায় ওই শৌচালয় হওয়ায় তাকে রক্ষণা-বেক্ষণ করতে পারাটা একটা দূরহ কাজ। তালা দিয়ে রেখেও দরজার উপর থেকে ইট-পাটকেল ও নানাবিধ নোংরা আবর্জনা ফেলত। কারণ উক্ত স্থানীয়দের জায়গা বাড়ানোই ছিল মূল লক্ষ্য।

বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজ তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে করতে হত। তারা যে ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের সহায়ক হবেন না নয়। ভীষণ কঠিন কাজ। গা শিউরে উঠবে। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে আশেপাশের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত থাকতো। প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যালয়ের ঘরে সকালে স্কুল করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে অল্প মাটি চাপা দেওয়া ও গর্ত খুঁড়ে চাপা দেওয়া বন্দুক, ভোজালি প্রভৃতি। খুব ভয় করতো। বাড়িতে এসে কিছু বলতাম না। বললে আর যেতে দেবে না। জানি না কী একটা অজানা জেদ আমাকে কুরে কুরে খেত যে অসহায় নিরক্ষর মানুষগুলিকে আমি একদিন সমাজের দরবারে নিয়ে ছাড়বো।

ঠিক সেই কারণেই ওখানকার বয়স্ক মেয়েদের নিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাসহ কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র ও যাতে কাজ পেতে পারে তার জন্য সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র ও মাটির কাজও চলতে থাকলো।

আমি আমার বাড়ির কাজে অবহেলা করলেও প্রথম ও শেষ অগ্রাধিকার ছিল বিদ্যালয় গঠনে। শিক্ষা দপ্তরে বারে বারে আবেদন জানিয়েছি। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ আরও বাড়ানোর জন্য কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। রোটারী ক্লাবে আবেদন জানিয়েছি বহুবার কিন্তু সাড়া পাইনি। পরবর্তীকালে শিক্ষকদের সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা প্রতিমাসে সামান্য কিছু টাকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অন্তত ৫০ পয়সা করে নিলেও শ্রেণীকক্ষের সমস্যা মেটানো সম্ভব হবে। আমি একটু বেশি দিতাম ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের থেকে ২০টাকা করে নিতাম।

তখন একপ্রকার কাঠের খাট বিক্রি হত। চওয়া ১ ফুট, লম্বায় ৭ ফুট, পাতলা মতো। ওইগুলি কিনে মিস্ত্রি লাগিয়ে দুখানা ঘর তৈরী করেছিলাম। তার থেকেও আমাদের রেহাই ছিল না। ওই কাঠের গায়ে যে পেরেক লাগানো হত তা তুলে উক্ত কাঠের তক্তাগুলি এক এক করে খুলে নিয়ে নিজেদের ঘরে লাগাতে লাগলো। আবার কেউ কেউ জ্বালানির কাজে ব্যবহার করতো। বিদ্যালয়ের মুলিবাঁশ, টালি, খুঁটি, কাঠের ছাট ইত্যাদি খোঁজখবর নিয়ে কোন দোকানে ভালো এবং সস্তা তাও আমাকেই করতে হত। অন্যরা বলতেন আমরা কিছু বুঝি না, কাজেই আমি যাতে করি সেকথাই বলতেন। আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম। স্কুল গড়ার পাঁচ বছর পর বিয়ে করি। তারা ছিলেন বিবাহিত।

এভাবে চলতে চলতে শিক্ষা দপ্তর আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর সি এম ডি-এর কাছে আমাদের বিদ্যালয়ের নাম নথিভুক্ত করান। ইত্যবসরে সরকারী পরিকল্পনায় বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। তাই দপ্তর থেকে আমরা চিঠি পাই যে শিক্ষাদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে বিদ্যালয় ভবন তৈরি হবে। আমি শিক্ষা দপ্তরের প্ল্যানটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করলাম যাতে অনেকটা জায়গা ঘেরা যায়। স্থানীয় লোকেরা উক্ত জায়গা ঘিরতে দিতে সম্মত ছিলেন না। আমাদের স্কুল কমিটিতে স্থানীয় রঞ্জিৎ রায় ও সুনীল বসু এই ব্যাপারে যথার্থ সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে ওনাদেরও অনেক ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কারণ স্থানীয় লোকেরা একদম চাইতো না যে বিদ্যালয়টা ভালোভাবে চলুক। তাদের একমাত্র বাসনা ছিল যে উত্যক্ত করতে করতে আমরা একদিন স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো, তাহলে তাদের বাড়ির জায়গা বাড়িয়ে ভাড়া দিতে পারবে। সেটা আর তারা পেরে ওঠেনি।

এরপর পাশের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখর চক্রবর্তী একটি বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও দুটো কাঠের চেয়ার খুবই কম টাকায় যোগাড় করে দিলেন।

২০০০ সালে সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থ থেকে কিছু কিছু অর্থ পেতে লাগলাম। তার বিনিময়ে আমাকে অনেক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নানা পরিকল্পনা রূপদান করতে হয়েছে। ২০০২ সালে ডঃ বিপ্লব দাসগুপ্ত মহাশয়ের সাংসদ কোটায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এলাকা বিধায়ক উন্নয়নের খাতে একলক্ষ টাকা এবং প্রাক্তন মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌর উন্নয়নের অর্থ দেড় লাখ, সর্বমোট সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এই টাকায় দ্বিতল ভবন ও এক তলায় একটা অফিসঘর সহ টয়লেট নির্মিত হয়, বিদ্যালয়ের নামে বিদ্যুৎ সংযোগ সাধিত হয় এবং পাখা ও লাইট কেনা হয়। বিদ্যালয়ের রেকর্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য আসবাব ক্রয় করা হয়। সর্বশিক্ষার অর্থ দিয়ে প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে টেবিল-চেয়ার তৈরী করানো হয় এবং দপ্তর থেকেও পাই। বিদ্যালয়ে জলের সংযোগ আনার জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর মালা রায় এবং কর্পোরেশন অফিসে প্রচুর ছোটছুটি করেছি। ২০০৮ সালে বাসের রেষারেষিতে গড়িয়াহাটের কর্পোরেশন অফিসে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম। পথচারীরা জল-বরফ দিয়ে সুস্থ করে তোলে। তৎসত্ত্বেও আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে জলের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলি। উনি আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে কিছু টাকা লাগবে। আমি অবশ্যই দেওয়ার সম্মতি জানাই। কিন্তু কিছুই লাভ হয়নি।

২০০৯ সালে আগস্ট মাসে আমি অবসর গ্রহণ করি। সেই থেকে অদ্যাবধি খুঁড়িয়ে চলি। তবে পরবর্তীকালে আমার কানে আসে যে বিদ্যালয়ে জল সংযোগ হয়েছে।

অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্কুলটি গড়ে তুলেছি। যা পরিশ্রম ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে আমাকে তা দিয়ে দশটা স্কুল গড়ে তোলা যেত।

আমার একটাই শেষ ইচ্ছা বিদ্যালয়টি যেন চিরকাল থাকে এবং উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়।

আমফান চিত্রমালা

মৃণাল দত্ত

ক্ষেতমজুর আমি
করোনায় কাজ নেই।
মধ্যদুপুরে
প্রবল ঝড়। আমফানে
ভাঙা টিনের চাল উড়ে গেলো
আমি ভিজছি ছেঁড়া ফাটা গেঞ্জি গায়ে
ইঁটের পায়া লাগানো চৌকিতে শুয়ে
ঘন কালো আকাশে দুশ্চিন্তার মেঘমালা
মাতব্বর এসে বললে—
যাও, রাণীর কাছে যাও।
ত্রিপল পাবে, বিশ হাজার টাকা পাবে।
ঝড়ের দাপট কমছে
আমি চলেছি রাণীর দরবারে ভেজা শরীরে
ভাঙা শিবমন্দিরে
ডালপালা ভাঙা বটবৃক্ষের নীচে
পুরোহিতরা বসে আছে।
আরে চাচা যে, এসো, এসো,
যাচ্ছো কোথা?
ঐ রাণীর কাছে প্রার্থনা নিয়ে।
যাবে? তবে দাও ত্রিপলের জন্য হাজারখানেক
ঘর তৈরী করার দশহাজার।
আর চাল ডাল নেবে নাকি?
তবে দাও দুশো
আমি দীন মজুর। এ্যাতো টাকা দেখিনি কখনো
ফিরে আসি রাণীকে না দেখে। এখন
খোলা আকাশে তারাদের মেলা
শুয়ে শুয়ে খালি পেটে ভাত দেখছি,
শিউলি ফুলের মতো।

শ্রমজীবি কিচেন

প্রতিবেদক - পুষ্পিতা রায়

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে চার ঘণ্টার নোটিশে লক ডাউনের ঘোষণায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষসহ অসংখ্য শ্রমজীবি মানুষ। তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু মানুষ। প্রথমে ১ এপ্রিল বিজয়গড় ১০ নং পুকুর পাড়ে, পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ জুন নবনগরে "জ্যোতিদেবী শ্রমজীবি ক্যান্টিন" শুরু করেছিল সস্তায় খাদ্য বিতরণ। এই ক্যান্টিন শতদিন অতিক্রান্ত করে বিজয়গর্বে এগিয়ে চলেছে।

সংগঠকদের কাছে এক একটা দিন এক একটা কঠিন থেকে কঠিন বাধা পার হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। শুরুর দিনগুলিতে অর্থাৎ লক ডাউনের শুরু হতেই এলাকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মুখে দুমুঠো খাবার তুলে দিতে বামপন্থী ছাত্র ও যুব কর্মীরা নিজেরা রান্না করে দৈনিক প্রায় ৬৫০ জনকে দিয়েছেন। যাদবপুর (বিজয়গড়) রান্নাঘর, শ্রীকলোনী রান্নাঘর, বাপুজিনগর রান্নাঘর, টালিগঞ্জ, নাকতলা, অরবিন্দনগর....একসাথে প্রতিদিন প্রায় ১২০০ জন কে একবেলার খাবার পৌঁছে দিত। ৭ই জুন স্থায়ীভাবে রান্নাঘর থেকে শ্রমজীবি ক্যান্টিনে উত্তরণ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। প্রতিদিন ৪০০—৫০০ জনের খাবারের ব্যবস্থা থাকে। মাত্র ২০ টাকা অনুদানের বিনিময়ে বামপন্থীরা নিজেদের সীমিত সাধ্য নিয়ে এবং বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে এই শ্রমজীবি ক্যান্টিন চালাচ্ছে এবং এগিয়ে যেতে চায় ১০০০ দিনের দিকে। লকডাউনের দিনগুলিতেও ক্যান্টিন সমভাবে সচল থাকে।

শততম দিনের অনুষ্ঠানে বিমান বসু, মহঃ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, বিকাশ ভট্টাচার্য, নাট্য পরিচালক অনীক দত্ত, সংগীতকার দেবজ্যোতি মিশ্র সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। লক ডাউনের সরকারী সমস্ত সতর্কতা পালন করে স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করার মত।

'জ্যোতিদেবী শ্রমজীবি ক্যান্টিন।' পরিচালনার দায়িত্বে আছেন যাদবপুর নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, ১২ নং নবনগর, যাদবপুর, কোলকাতা-৩২।

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

করোনা অতীমারীর কারণে আমাদের ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক কিছুদিন বন্ধ থাকার পর গত ১ জুন ২০২০ তারিখ থেকে পুনরায় চালু করা হয়েছে।

বর্তমানে ফিজিও থেরাপী, আকুপাংচার সহ ডাক্তারী পরিষেবা চলছে।

যোগাযোগ ঃ 9674553477
9163531906
9073187022

প্রতি বছরের মত এ বছরও ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ২০২০-২১ সালের সদস্যপদ নবীকরণ হওয়ার কথা। কিন্তু Covid-19 এর কারণে অনেকের পক্ষেই একাজ করা সম্ভব হয়নি। সংস্থার সকল সদস্য/সদস্যাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে আপনাদের সদস্যপদ নবীকরণ করুন এবং পরিচিতদের সদস্যপদ নবীকরণে সাহায্য করুন।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৬টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)
প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- Bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatrics.in